Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 01-12
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে যোগ ও জীবন

ধরিত্রী মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, রামমোহন কলেজ, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.03.2025; Accepted: 17.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Yoga is an ancient and controversial method. The word 'yoga' is derived from the Sanskrit word 'yuj'. It means to join or unite. Yoga refers to the union of the soul and the Supreme Soul. According to Sri Aurobindo, yoga is a path of practice through which a person realizes The Supreme Soul within himself. According to him, the Supreme Soul, in the form of Sachchidananda, being blissful, is active at the same time and shrinks itself in various form, this is the descent of the Supreme Soul. The form and origin of the soul is this Supreme Soul. In the process of Evolution, in order to return to the form of The Supreme Soul, beyond the level of the mind guided by the rational intellect and go to the Supramental level, the seeker needs this Integral Yoga. In Integral Yoga, The Supreme Soul is realized not only in the individual but also in the entire human society, in all beings. In Integral Yoga, the whole life is Yoga. The body, soul and mind are all equally important. In Integral Yoga, everything is realized in an integral and complete form for the seeker.

Keyword: Involution, Evolution, spiritualism, Metaphysics, Integral Yoga.

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যে সমস্ত মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রীঅরবিন্দকে কোনও বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। বিস্ময়কর ছিল তাঁর জীবনাদর্শ যা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মোচনের সঙ্গেই জীবনের ব্যাবহারিক প্রয়োজন পূরণের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনি কেবল একজন দার্শনিক নন, বর্তমান যুগের একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষিও যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন। চিন্তার সুবিশাল ব্যাপ্তির কারণে শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংকীর্ণ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে অতিক্রম করে ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পুনঃ জাগরণের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁকে আন্তর্জাতিক মানব ঐক্যের উদ্গাতাও বলা যায়। একই সঙ্গে তিনি সমকালীন জগতের একজন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক। তবে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হল তিনি একজন যোগী এবং সাধক। আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস থাকায় তিনি মনে প্রাণে স্বীকার করতেন সঠিক সাধন পথে অগ্রসর হয়ে আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত আপন অন্তরে অধিষ্ঠিত পরম চৈতন্যময় সর্বময় সত্তাকে উপলব্ধি করা। যে ব্যক্তি এই অনুভূতি লাভে সমর্থ হবেন তিনি দিব্য জীবন লাভ করবেন, আর যোগই হল সেই সাধন পথ যা ব্যক্তিকে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য লাভে সহায়তা করবে। পূর্ণাদ্বৈতবাদী শ্রীঅরবিন্দ উপনিষদীয় সত্যে বিশ্বাসী হওয়ায় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকেই একমাত্র পরমসত্য বলে মনে করেছেন এবং জগত হল এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের সীমিত রূপ। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে আনন্দময় পরমব্রহ্ম নিজেকে বিভিন্ন আকারে আকারিত করে চলেছেন। তাই তিনি মনে করেন, জগতের সকল বস্তুই সেই ব্রহ্মের খণ্ডিত প্রকাশ। তাঁর মতে, যোগের যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা এই সত্য অনুসন্ধান করা সম্ভব। দিব্যজীবন কী তার যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি তাঁর The Life Divine গ্রন্থে সুগভীর ভাবে তুলে ধরেছেন এবং যোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা তাঁর The Synthesis of Yoga গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে

তাঁর আধ্যাত্মিকতার সাধনার কোনও বিরোধ ছিল না। তিনি শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবসমাজের বা বিশ্বমানব মুক্তির সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তবে অন্যান্য ভারতীয় দর্শন যেভাবে মুক্তি বা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভকে ব্যক্তিজীবনের চরম লক্ষ্য বলে ব্যাখ্যা করেছে শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু সেরূপ ব্যক্তি-মুক্তির ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। উপনিষদীয় সত্যে আস্থাশীল শ্রীঅরবিন্দ জগতের যাবতীয় বিষয়কে ব্রহ্মেরই সীমিত রূপ বলে স্বীকার করায় অন্য সবকিছুর সঙ্গে ব্যক্তির অভিন্নতা উপলব্ধি করার জন্য চেতনার বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। যোগের অনুশীলন এই অভিন্নতা উপলব্ধির সহায়ক। শ্রীঅরবিন্দ কেবল দিব্যজীবন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাই করেননি, তিনি নিজে সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে যে দিব্যজীবন লাভ করেছেন সকলকে সেই তত্ত্ব উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি এই সত্য উপলব্ধির উপায় যে যোগ সেই যোগের যথাযথ মার্গ নির্দেশ করেছেন। সুতরাং বলা যায় শ্রীঅরবিন্দ যে আধ্যাত্মিক সত্যের কথা বলেছেন তা কিন্তু কেবল কোনও তত্ত্বকথা না, এ তাঁর উপলব্ধ সত্যের আলোচনা। তিনি যোগ সাধনার মাধ্যমে সেই পরমব্রহ্মের অস্তিত্বকে, সেই পরমচৈতন্যকে জগতের প্রতিটি বস্তুতে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এই অধ্যায়ে আমার উদ্দেশ্য হল শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে যোগ বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করা।

প্রাচীন ভারতে যোগের অর্থ

যোগ হল প্রাচীন কাল থেকে চর্চিত বহু বিতর্কিত একটি পন্থা। সংস্কৃত 'যুজ্' ধাতু হতে 'যোগ' শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ হল সংযুক্ত হওয়া বা মিলিত হওয়া। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই 'যোগ'। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এমন অনেক মহান ব্যক্তি ছিলেন বা আছেন যাঁরা জীব জগতকে দুঃখময় মনে করেন এবং জীব জগতকে এই দুঃখের থেকে মুক্ত করার জন্য নিজের জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে যোগ সাধনায় নিবিষ্ট থেকেছেন । তাই 'যোগ' শব্দের সঠিক অর্থ কি তা জানতে হলে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই শব্দের তাৎপর্য ব্যাখা করতে হবে। সাধারণ অর্থে দুটি পৃথক বস্তুকে একত্রে মিলিত করার পন্থাই হল 'যোগ'। সাধনার জগতে এই দুটি পৃথক বস্তুর একটি হল জীবাত্মা যাঁকে আমরা সাধক রূপে গণ্য করি। আর অপরটি হল পরমাত্মা যিনি পরম চৈতন্যময় ব্রহ্ম, যাঁর বিকল্প আর কিছুই নেই। এই পরম চৈতন্যময় সত্তাই শ্রেষ্ঠ, এক এবং একই সঙ্গে এই বৈচিত্র্যময় জগতের প্রত্যেকটি কণাতে তাঁর অবস্থান এমনকি এই বিশ্বকে অতিক্রম করেও তাঁর অস্তিত্ব আছে। যোগ সাধনার মূল উদ্দেশ্যই হল সেই পরমব্রহ্মকে জানা, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন মতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই বিবিধ মতের পার্থক্য মতভেদ অনুসারে বিবিধ সাধন পদ্ধতি বা সাধন প্রণালীর উপদেশও লক্ষ্য করা যায়। আবার সংস্কৃত 'যোগ' শব্দের একাধিক অর্থও আছে। শারীরিক ও নৈতিক নিয়ম-নীতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করাই যোগশাস্ত্রের সর্বপ্রথম শিক্ষা যার উপর ভিত্তি করেই আমরা সুস্থ, দৃঢ় দেহ লাভ করতে পারি এবং আমাদের জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তাই *সমাধি পাদের* প্রথম সূত্র অনুসারে 'যোগ' হলো "অথ যোগানুশাসনম্" অর্থাৎ যোগ অনুশাসন শাস্ত্রের বিষয় হল 'যোগ'। ভারতবর্ষে যোগশিক্ষা বা যোগ সাধনার ধারা যে বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল তার আভাস আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বা বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী পাঠ করতে লক্ষ্য করি। সেখানে আমরা দেখি দেবতারা সাধনার দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন, আবার মুনি ঋষিরাও যোগ সাধনার মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে বিভিন্ন শুভ অশুভ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বলতে হয় যে অশুভ শক্তির প্রতীক অসুররাজও এই সাধনার দ্বারা অমরত্বের বর লাভ করেছিলেন। আবার অনেকে এই যোগ সাধনার দ্বারা মুক্তি বা মোক্ষ লাভের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন। কোনও কোনও মনীষি কেবল নিজের মোক্ষের জন্য সাধনার পথ অনুসরণ করেছেন; আবার কেউ বা যোগ সাধনার দ্বারা নিজের মুক্তি লাভ করে অপরকে মুক্তি লাভে সহায়তা করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ নিজে এক অশ্বত্থ গাছের পাদদেশে এই ধ্যানযোগের দ্বারাই 'বোধি' লাভ করেছেন যার দ্বারা জীব কী ভাবে দুঃখের থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করবে তার সন্ধান তিনি বিশ্ব সমাজকে দিয়েছেন। এই ভাবে বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানুষ আপন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অংশ রূপে, জীবন ও জগতের সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক দিন যোগাভ্যাস করতেন। প্রাচীন কালের সত্যদ্রষ্টা মণিঋষি যাঁরা যোগ সাধনার দ্বারা নিজের এবং অপরের শরীর, মনকে বোঝার ও

নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জন করেছিলেন ও আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছেন তাঁরা তাঁদের উপলব্ধ অভিজ্ঞতার সমগ্র বিবরণ সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন যা ক্রমে যোগশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন যোগীদের উপলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ভারতীয় সংস্কৃতিতে যোগসাধনার একাধিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। তাই এই 'যোগ' শব্দটির উৎপত্তির সময় আমরা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে না পারলেও বেশ কিছু পুরনো গ্রন্থে 'যোগ' শব্দের ব্যবহার আমরা পেয়ে থাকি। যেমন বিভিন্ন উপনিষদে যোগের উল্লেখ ও যোগের বিধান যোগের প্রাচীনতাকেই প্রমাণ করে।[1] *কঠোপনিষদে* উল্লেখ আছে

> "প্রাজ্ঞব্যক্তি (জ্ঞানলাভেচ্ছু যোগী) বাগিন্দ্রিয়কে মনে, মনকে বুদ্ধিরূপ আত্মাতে অর্পণ করবেন। বুদ্ধি মহান আত্মাতে এবং মহান আত্মাকে শান্ত আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে নিয়োজিত করবেন"।[2]

আবার *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* অনুসারে "যোগ হল মনকে সংযত করার উপায়, এর মাধ্যমে প্রাণবায়ু সংযত করে শরীরকে স্থিরভাবে অবস্থান করা। ফলে ব্যক্তি প্রাণ নিরুদ্ধ করে নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করবে, এভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি মনকে সংযত করে"[3] । মহাভারতে বলা হয়েছে-----

> 'এতন্মহার্ণবং ঘোরমগাধং মোহসংজ্ঞিতম্ ।
> সংক্ষিপচ্চৈব বোধয়েৎ সামরং জগৎ।।'

'অর্থাৎ পুরুষ মোহযুক্ত এই স্থূল শরীররূপ ভয়ংকর ও অগাধ মহাসমুদ্রকে যোগনৌকা দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেন, তপস্যা দ্বারা সংক্ষিপ্ত করিবেন এবং জ্ঞান দ্বারা স্বর্গলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের বুদ্ধিগোচর করবেন'। এছাড়া পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও জড়বাদী দর্শন বা চার্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি শাখাতে আত্মোপলব্ধি ও মোক্ষলাভের পন্থা রূপে যোগ সাধনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে ভারতীয় দার্শনিক মহর্ষি পতঞ্জলির দর্শনে যোগ সাধনা ও যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ থাকায় তাঁর দর্শনকে যোগ দর্শন বলেও গণ্য করা হয়।[4]

পশ্চাত্যে 'যোগ' এবং 'যোগী' বিষয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই মনে করেন যোগ হল অসাধু লোকের অসৎ উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম, যার দ্বারা যোগী অবিশ্বাস ও অলৌকিক সব কর্ম সাধনের প্রয়াস করে। তাই তাঁদের কাছে যোগীরা হলেন ফন্দিবাজ, প্রতারক। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বলতে হয় সকল যোগী বা সাধক যে এইরকম নিম্ন লক্ষ্য সাধনের জন্য যোগ সাধনা করেননি বা যোগ সাধনার কথা বলেননি তার প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি ভারতীয় বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গ্রন্থে যোগের ব্যাখা থেকে। কেবল ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, অতীতে পাশ্চাত্যের তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও যোগশিক্ষার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। স্বামী অভেদানন্দের মতে, পিথাগোরাস, প্লেটো, প্লটিনাস, প্রোক্লাস প্রভৃতি ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় জ্ঞানবাদীদের মধ্যে এই যোগশিক্ষার প্রচলন ছিল। এছাড়া খ্রিষ্টান মরমীসম্প্রদায়, রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সাধকেরাও যোগ অভ্যাস করতেন।।[5]

অন্যান্য ভারতীয় যোগপন্থা

যেহেতু যোগের দ্বারাই মানুষ নিজের অন্তরে পরমাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করে তাই আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে একাধিক যোগপন্থার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, তন্ত্রযোগ। এই প্রত্যেকটি যোগ জীবনের এক একটি অংশকে গুরুত্ব দেয় এবং বিশেষ সেই অংশের উত্তরণই সেই যোগের মূল লক্ষ্য। যেমন হঠযোগের সাধনা দেহ ও প্রাণকে কেন্দ্র করে। তাঁরা মনে করেন কঠোর

---

১ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ষড় দর্শনঃ যোগ,* পৃষ্ঠা- ৩

২ *কঠোপনিষদ,* ১/৩/১৩

৩ '*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ',* ২/৮

৪ পাল, ডঃ বিপদভঞ্জন, *ভারতীয় দর্শন,* পৃষ্ঠা- ২২০

৫ স্বামী, অভেদানন্দ, *যোগশিক্ষা,* কলকাতা- রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,২০১৮, পৃষ্ঠা- ৭-৯

কৃচ্ছতাসাধনের দ্বারা দৈহিক ও প্রাণিক শক্তিকে জয় করতে পারলে তবেই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সম্ভব। রাজযোগের সাধনা হয় দৈহিক ও প্রাণিক শক্তির উর্দ্ধে মনকে কেন্দ্র করে। তাঁরা মনে করেন একাগ্রতা এবং পূর্ণ বিকশিত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে শান্ত করলে তবেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজযোগে আটটি অঙ্গ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়। - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি। যম বলতে বোঝায় অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে সাধনা করা। আবার শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এগুলির যথাযথ পালন করাকে নিয়ম বলে। রাজযোগে বলা হয় মনের স্থিরতার জন্য দরকার শারীরিক সুস্থতা তাই কঠোর কৃচ্ছতাসাধন নয় বরং শারীরিক সুস্থতার জন্য শরীরকে কোনও প্রকার কষ্ট না দিয়ে সাধক যে উপবেসন করেন তাকে আসন বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে, মনকে শান্ত বা বাহ্য বিষয় শূন্য করার আরেকটি মাধ্যম হল প্রাণায়াম। 'প্রাণায়াম' শব্দকে বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ পাই- 'প্রাণ' শব্দের অর্থ হল জীবনী শক্তি আর 'আয়াম' শব্দের অর্থ হল সংযম। তাই প্রাণায়াম কথাটির অর্থ হল যার দ্বারা আমাদের শরীরে জীবনী শক্তি বা প্রাণবায়ুর গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর প্রাণায়াম দ্বারা যখন মনের সকল প্রকার চঞ্চলতা শূন্য হয়ে মন স্থির হয় তখন এই পর্যায়কে রাজযোগে প্রত্যাহার বলা হয়। এখন মন যেহেতু সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির তাই মন এই প্রত্যাহারের স্তরে পৌঁছানোর পর বাহ্য বা আন্তর কোনও একটি বিষয়ে স্থির ভাবে চিন্তা করতে পারে। রাজযোগে মনের এই অবস্থাকে বলা হয় ধারণা। আর সাধক যদি এই একটি বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকতে পারেন তবে তাকে ধ্যান বলা হবে। সবশেষে সাধকের সমাধির অবস্থা। দীর্ঘসময় কোনও একটি বিষয়ে মন ধ্যানরত অবস্থায় থাকার ফলে সাধকের মন বিষয়ের মধ্যে এতোটাই নিবিষ্ট হয় যে বিষয়, কর্তা আর ধ্যান সমন্বিত হয়ে সকল প্রকার ভেদ জ্ঞান দূর হয়ে সবই সেই পরমাত্মা এমন জ্ঞান হয় সাধকের। এই অবস্থাকেই রাজযোগে সমাধি বলা হয়। জ্ঞানযোগে বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক জ্ঞান দ্বারা এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করাই হল লক্ষ্য। তাঁরা মনে করেন জ্ঞান ব্যাতিত মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। যখনই জ্ঞান হবে যে ব্রহ্মই একমাত্র পরমসৎ বাকি সব অর্থাৎ এই প্রাতিভাসিক জগত মিথ্যা তখন আর কর্মের প্রয়োজন হবে না, জীবের মুক্তি লাভ হবে। ভক্তিযোগে বলা হয় এই জগত হল ভগবানের প্রেমের লীলাক্ষেত্র তাই ভগবানকে পেতে হলে সেই প্রেম প্রীতির দ্বারাই ভক্তের অন্তরে ভগবানের সঙ্গে সান্নিধ্য পেতে হবে। তার জন্য ভক্তকে সর্বদাই প্রেম প্রীতির আনন্দে বিভোর থাকতে হবে। কর্ম করতে গেলে সেই আনন্দে ছেদ পড়তে পারে তাই কর্মের প্রয়োজন নেই। কর্মযোগের লক্ষ্য হল কর্মফল ভোগের উর্দ্ধে কর্ম করে পরমাত্মাকে লাভ করা। অর্থাৎ এদের মতে কর্মই সমস্ত সুখ দুঃখের কারণ। কর্ম করলেই তার ফলভোগ অনিবার্য কিন্তু যদি আমরা কর্মবাদ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশে যে নিষ্কাম কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন তেমন নিষ্কাম কর্ম করি তাহলে কোনও ফলভোগ করবো না। কর্মবাদে কর্ম ত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের মূল লক্ষ্য হল দীন-দুঃখী, পাপী-তাপীর সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করতে চেয়েছেন এবং কর্ম ত্যাগ নয় বরং এই কর্ম করার জন্য বারং বার জন্ম গ্রহণ করা। আমরা শ্রীঅরবিন্দের দর্শনেও দেখব তিনি ব্যক্তির মুক্তিতে সাধনার সমাপ্তি বলছেন না বরং তাঁর যোগের লক্ষ্য হল ব্যক্তির মুক্তির সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজের মুক্তি এবং কর্ম ত্যাগ নয় পরমাত্মার সঙ্গে একিভূত হওয়ার পর সমগ্র মানব সমাজকে সেই একই উপলব্ধি করানোর উদ্দেশে কর্ম করার এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করার কথা তিনি বলেন। কিন্তু তফাৎ হল স্বামী বিবেকানন্দ শুধু মাত্র দীন-দুঃখী ও পাপী-তাপীদের নিয়ে ভেবেছেন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র মানব সমাজ তথা সর্বভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন এবং এই কাজকে তিনি পূর্ণযোগীর কর্তব্য বলে মনে করেছেন। আবার এই সমস্ত যোগপন্থা সমূহের থেকে তন্ত্রযোগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তার তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠতার জন্য। অন্যান্য যোগপন্থার মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তির মুক্তি; মুক্তিতেই তাদের সাধনার সিদ্ধি। পুরুষ বা আত্মাই সেখানে কর্তা যিনি একই সঙ্গে জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও পরিচালকও। তন্ত্রের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুক্তিতে সিদ্ধি নয়, ভক্তিকে এবং ব্যবহারিক জীবনের আনন্দকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্য সব তত্ত্বই পুরুষকে প্রধান বলে মনে করে। কিন্তু তন্ত্রে পুরুষকে স্বীকার করলেও প্রকৃতিকে(সক্রিয় শক্তি) পুরুষের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সক্রিয় শক্তির উপাসনাই হল তন্ত্রের বিশেষত্ব। সে কারণে প্রকৃতি তন্ত্রযোগে মহামায়া রূপে পূজিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের কাছেও এই তন্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বেদান্তের সঙ্গে তন্ত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও বামাচারমার্গের কিছু ভূলের জন্য তন্ত্রের ওপর মানুষের কিছু অসন্তোষও যে আছে সে কথাও তিনি অস্বীকার

করেননি। কিন্তু সমগ্র তন্ত্রের মুখ্য তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, সমস্ত যোগপন্থার মধ্যে একমাত্র তন্ত্রে আমরা সমগ্র যোগপন্থার কেন্দ্রীয় ভাবনার সন্ধান পেতে পারি। অর্থাৎ তন্ত্র সাধনাতে আমরা যেমন হঠযোগের কুণ্ডলিনী শক্তির উল্লেখ পাই, তেমনই অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত বেশ কিছু যেমন যম, নিয়ম ও সমাধি ইত্যাদির উল্লেখ দেখি। আবার জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ ও কর্ম মার্গ এই প্রত্যেকটির স্থান এই তান্ত্রিক সাধনাতে আমরা লক্ষ্য করি। আবার তন্ত্র সাধনার প্রধান লক্ষ্য হল অদ্বৈত পরমব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা। প্রকৃতিকে বা মহামায়াকে মা রূপে পূজা করার সঙ্গেই তন্ত্র কর্মকেও গুরুত্ব প্রদান করে।[৬]

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে যোগ বলতে আমরা একেবারে নতুন কোনও তত্ত্বের কথা যেমন বলতে পারি না, তেমন আবার পূর্বের যোগপন্থাগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যও দেখি না। শ্রীঅরবিন্দ মূলত সমগ্র যোগপন্থার কেন্দ্রীয় তত্ত্বের অনুসন্ধান করেছেন এবং তাদের মধ্যে এক সমন্বয়সাধন করে পূর্ণযোগের ধারণা গঠন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব একটি অভিনব তত্ত্ব রূপে স্বীকৃত হয়। প্রথমেই আমি শ্রীঅরবিন্দের যোগের ধারণার অনন্যতা, তার স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা উল্লেখ করব।

প্রথমত- অন্যান্য সকল যোগ শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজের মুক্তির জন্য যোগপন্থা অবলম্বন করার কথা বলে। মূলত এই জগতকে মিথ্যা বলে মনে করা হয় এবং এই মিথ্যা জগত ত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের মূল ভাবনাটি সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, যোগীর মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে ব্রহ্ম স্বরূপ বলে চিহ্নিত করার সঙ্গেই সমগ্র জগতও যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তা অনুধাবন করা। তিনি স্বীকার করেন, ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্যক্তি এবং জগতও তেমনই সত্য, বরং এদের মধ্যে আছে অভেদের সম্পর্ক যেহেতু ব্রহ্মই নিজের ইচ্ছায় নিজেকে সীমিত করে বিভিন্ন রূপে আকারিত হয়েছেন। তাই এই জীবন ও জগতকে উপেক্ষা করে নয়, বরং জীবন ও জগতকে নিয়েই সেই পরমব্রহ্মকে লাভ করা হল পূর্ণযোগের চরম উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, আমাদের প্রাকৃত জীবনের যে শক্তি তা দ্বারা এই চরম উদ্দেশ্য সফল হওয়া সময় সাপেক্ষ হলেও পূর্ণযোগের দ্বারা এই জীবনেই সেই অভেদ জ্ঞান লাভ সম্ভব হতে পারে। অভেদ বলতে শুধুমাত্র নিজ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভেদ উপলব্ধি নয়, অভেদ বলতে এই জগতের সমস্ত ধ্বংস, স্থিতি ও সৃষ্টি এই সবকিছুর মধ্যে এবং এই জগতকে ছাড়িয়ে এই পরমাত্মার উপস্থিতি এবং এই পরমাত্মার সঙ্গে নিজ আত্মার অভেদের জ্ঞান হয় বা উপলব্ধি হয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে, আনন্দময় ব্রহ্মের দ্বিবিধ অবস্থা, একটি হল পরিবর্তনশীল অবস্থা যাকে তিনি জগত সত্তা/অদিব্য/সক্রিয় অবস্থা/অপরা প্রকৃতি বলেছেন। এই অবস্থা হল পরিনামী, জগতের আধার। আরেকটি হল অপরিবর্তনশীল অবস্থা যাকে তিনি নিষ্ক্রিয় অবস্থা/দিব্য/পরা বলেছেন যা হল অসীম, অখণ্ড, পূর্ণ।[৭] শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, পূর্ণযোগে যোগীর লক্ষ্য হল এই পরিবর্তনশীল জগতের উত্তরণ ঘটিয়ে সেই পরম অপরিবর্তনশীল ব্রহ্মকে জানা। তাই মানুষের কর্তব্য হল দৈনন্দিন জীবনের এই পরমসত্যকে জানার ফলে ব্যক্তি উপলব্ধি করবে যে এই জগতের সমস্ত কিছুর উৎস সেই চৈতন্যময় পরমপুরুষ। অর্থাৎ জগতের সকল সসীম বস্তু ব্রহ্ম সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসীমতাকে আবিষ্কার করার জন্য সমস্ত চাওয়া, পাওয়া, উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়কে পরমব্রহ্মের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা। এই চরম সত্যকে জানার জন্য আমাদের চৈতন্যের বিস্তার ঘটাতে হবে। ধাপে ধাপে আমাদের চৈতন্যের বিস্তার ঘটালে আমরা বিশ্বজগতে পরিব্যপ্ত চৈতন্যের সঙ্গে নিজেদের অভেদ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হব। আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে ঐ এক সর্বত্র পরিব্যপ্ত চৈতন্যই জগতের সকল কিছুর মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। ফলে ব্যক্তি সকলের সঙ্গে তার অভিন্নতা উপলব্ধিতে সমর্থ হবে। আবার জগতের সবকিছুর মধ্যে, এমনকি জড়েও ব্রহ্মের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করবে ব্যক্তি তখন অপরিবর্তনশীল অবস্থায় থেকে এই পরিবর্তনশীল জগতকে প্রত্যক্ষ করবে। তাঁর মতে, যখনই আমাদের পক্ষে এই লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব হবে তখন আমরা উপলব্ধি করব জড়জগত ও চৈতন্যময় পুরুষের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও বৈপরীত্য নেই; যা কিছু আছে তা সবই সেই পরমব্রহ্মের মধ্যে আছে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম

---

[৬] ঘোষ, প্রমদারঞ্জন, (অনুবাদক ও সম্পাদক), *শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা ও জীবন দর্শন,* পৃষ্ঠা- ২৫২-২৬৭

[৭] ঘোষ, প্রমদারঞ্জন, (অনুবাদক ও সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬৬-২৭৬

নিজের আনন্দের জন্য সর্বদাই নিজেকে নানা রূপে সঙ্কুচিত করে চলেছেন, আবার নিজেই তা দেখছেন, বুঝছেন, জানছেন আবার ধ্বংস হয়ে নিজের মধ্যে বিলীন হচ্ছেন। তাই এই অপরিবর্তনশীল পরমব্রহ্মকে লাভ করাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধুমাত্র সেই পরমব্রহ্মের কাছে পৌঁছানো যদি একমাত্র লক্ষ্য হত তাহলে শ্রীঅরবিন্দ মনে করেছেন, পূর্ণযোগের প্রয়োজন হত না; যেকোনও একটি সহজ যোগপন্থা অবলম্বন করলেই তা সম্ভব হত। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য তা নয়। তাঁর মতে অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিতে উত্তরণই যোগীর একমাত্র কাজ নয়। বরং একই সঙ্গে অপরা প্রকৃতির মধ্যে পরা প্রকৃতিকে নামিয়ে আনাই হল তার মুখ্য কাজ। তাই আমাদের সকল যোগপন্থার সমন্বয় প্রয়োজন। যোগীর কাজ তাই ব্যক্তির নিজের মুক্তি নয়। তাকে ঐ চেতনপুরুষকে জগতে নামিয়ে আনতে হবে যাতে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে যে ঐ চেতনসত্তার উপস্থিতি জড় জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও উপস্থিত। শ্রীঅরবিন্দ যে আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়েছেন তা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হবে যদি যোগী প্রত্যক্ষ করে যে জড়েও চৈতন্যের আভাস আছে। জড় বস্তু যাকে আমরা অচেতন বলে মনে করি তাও যে ঐ পরমচৈতন্য থেকেই সৃষ্ট তা অনুধাবন করলে তবেই পূর্ণাঙ্গ যোগের ধারণা সফল হবে।[৪]

দ্বিতীয়- অন্যান্য সমস্ত যোগে বাঁধাধরা কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয় । শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে তেমন ভাবে ছকে বাঁধা কোনও নিয়ম নীতির প্রসঙ্গ নেই। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, উত্তরণের পথে জীবনের কোনও অংশ, কোনও অভিজ্ঞতা, কোনও অনুভুতি ইত্যাদির কোনও কিছুকেই অস্বীকার করা যাবে না। প্রত্যেকটা পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে, সমগ্র জীবনই হল যোগ।

তৃতীয়- অন্যান্য কিছু দর্শনে ব্যক্তির মুক্তির পর অন্যের মুক্তিতে নৈতিকতার প্রসঙ্গ আসে, করুণার প্রসঙ্গ আসে কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল ব্যক্তির মুক্তির সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজের মুক্তি। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে, এমন সামগ্রিক উত্তরণের ক্ষেত্রে নৈতিকতার কোনও প্রসঙ্গ নেই সবটাই সাধকের বা যোগীর কর্তব্য। তাঁর লক্ষ্যই হলও সবার উত্তরণ।

চতুর্থ- অন্যান্য যোগ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। যেমন জ্ঞানযোগ জ্ঞানে, ভক্তিযোগ ভক্তিতে, কর্মযোগ কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়ে তত্ত্ব প্রদান করে। হঠযোগে শরীর ও প্রাণের উপর, রাজযোগে মনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে জীবনের কোনও কিছুকে উপেক্ষা করা হয়নি। যেহেতু সমগ্র জীবনই যোগের অন্তর্ভুক্ত। তাই শরীর, প্রাণ, মন, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম সবকিছুরই প্রয়োজন আছে জীবন পরিচালনার জন্য। কোনটাকেই অস্বীকার করার কোনও জায়গা আমাদের নেই। অন্যান্য তত্ত্বে ব্যক্তির ব্রহ্ম লাভ হলেই যোগের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ব্যক্তির উত্তরণ হওয়ার অর্থ তার সাধনার শুরু। সমগ্র জগতের উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে বা পরমব্রহ্মের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে ব্রতী হতে হবে। দিব্যজীবন লাভ ব্যক্তির সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সমগ্র জগতের উত্তরণ সম্ভব হচ্ছে। দিব্যজীবন বলতে কী বোঝায় বা জগতের উত্তরণ বলতেই বা শ্রীঅরবিন্দ কী বুঝিয়েছেন এই সবটার যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য এবং শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ প্রকৃত অর্থে কী তা বোঝার জন্য এখন আমাদের সংক্ষেপে শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যক তত্ত্বকে বুঝতে হবে।[৯]

শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যক তত্ত্ব

শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যক তত্ত্ব বা অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরমতত্ত্বের আলোচনা। সাধারণত আমরা পরমতত্ত্বের দুটি ধারা পেয়ে থাকি – জড়বাদী তত্ত্ব, যার মূল বক্তব্য হল জড়ই পরমতত্ত্ব, জড় থেকেই যেমন সমস্ত কিছুর উৎপত্তি তেমন জড়তেই সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি। অপর ধারা হল অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদের বক্তব্য হল চৈতন্যই পরমতত্ত্ব। চৈতন্যই একমাত্র সত্য বাকি জগত মিথ্যা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থটিতে এই দুটি চরম মতবাদের কোনওটিকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বর্জন করেননি; বরং দুয়ের সমন্বয়ে তিনি পূর্ণাদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করেন। সেখানে তিনি বলেছেন চৈতন্য যেমন চরম সত্য জগতও তেমনই সত্য এবং একে অপরের পরিপূরক। চৈতন্য বলতে শ্রীঅরবিন্দ এখানে মানসিক চেতনার অতিরিক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্মের

---

[৮] চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ (অনুবাদক), *শ্রীঅরবিন্দ যোগসমন্বয়,* পন্ডিচেরী- শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩২-৩৫

[৯] ঘোষ, প্রমদারঞ্জন (অনুবাদক ও সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬৬-২৭৬

কথা বলেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের দুটি অবস্থা নিষ্ক্রিয় বা অপরিবর্তনশীল অবস্থা ও সক্রিয় বা পরিবর্তনশীল অবস্থা। ব্রহ্ম যেমন সৎ ও চৈতন্য স্বরূপ তেমনই আনন্দ স্বরূপ। 'আনন্দ' এই শব্দটির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মের এই দুই অবস্থাকেই বুঝিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ব্রহ্ম স্বাধীন বা মুক্ত সত্তা ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ব্রহ্ম যেমন এক তেমন বহু হওয়ার সম্ভবনাও তাঁর মধ্যে সঞ্চিত আছে। আর যখন তাঁর সেই বহু হওয়ার সম্ভবনাকে বাস্তবায়িত করে তখন চিৎশক্তি নিজের সঙ্কোচন ঘটিয়ে এই জগতে বিভিন্ন বস্তুর উৎপন্ন করে। ব্রহ্মের পরিবর্তনশীল এই অবস্থাকে বলা হয় আনন্দ (Delight)। আর যখন ব্রহ্ম তাঁর সমস্ত সম্ভবনা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন (সাক্ষী চৈতন্য), কোনও ক্রিয়া করেন না বা অপরিবর্তনীয় থাকেন, সেই অবস্থাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় অবস্থা। পরমসত্তার মধ্যে এই Delight বা আনন্দের অবস্থা ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা একই সঙ্গে থাকতে পারে। কারণ সৃষ্টি যখন না হয় তখন ব্রহ্মের মধ্যে শুধুই নিষ্ক্রিয় অবস্থা থাকে আর সক্রিয়তা তখন সম্ভবনা হয়ে থাকে কিন্তু সৃষ্টির সময় ব্রহ্মের আনন্দের অবস্থা যেমন থাকে তেমন একই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় অবস্থাও থাকে। যেহেতু জীবসত্তা ও জগৎসত্তাকে ছাড়িয়েও ব্রহ্মের পরমসৎ এর অবস্থা আছে তাই এই পরিবর্তন ছাড়াও ব্রহ্মের মধ্যে অপরিবর্তনশীলতার অবস্থা সবসময় বিরাজ করে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, ব্রহ্ম যে আনন্দময় স্বাধীন, তারই প্রকাশ রূপে ব্রহ্মের অবরোহণ (Involution) প্রক্রিয়া যেখানে সচ্চিদানন্দ থেকে আসে অতিমানস (Super Mind) স্তর, যে নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক বলে জানে একইসঙ্গে সে বহু হতে পারে এই জ্ঞানও তার থাকে। তার এই বহু হতে পারার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অতিমানস(Super mind) নিজের সঙ্গে নিজের আড়াল সৃষ্টি করে চেতনার সঙ্কোচন ঘটায় যার ফলে তখন এককে আর এক রূপে দেখা সম্ভব হয় না কোনভাবে বহুরূপে দেখতে হয়, এই হল আনন্দময় ব্রহ্মের প্রথম সঙ্কুচিত স্তর অতিমানস (Super mind)। এর পরবর্তী স্তর হল অধিমানস স্তর এই স্তর থেকেই অনুভূতি গুলো পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন সচ্চিদানন্দ ইচ্ছা করেই চেতনার সঙ্কোচন ঘটিয়ে সম্পূর্ণকে না জানার চেষ্টা করে। এবং এইভাবে চেতনার সঙ্কোচন ঘটাতে ঘটাতে ক্রমে অধিমানস স্তর থেকে মনের স্তর, মনের স্তর অতিক্রম করে প্রাণিক স্তর এবং সব শেষে চেতনার সব থেকে সঙ্কুচিত রূপ হল জড়ের স্তর। এই হল সচ্চিদানন্দের অবরোহণ প্রক্রিয়া। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ব্রহ্মের এই অবরোহণ প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, চেতনাই হল পরমসৎ, জড়জগৎ হল চেতনার প্রকাশ। চেতনা হতেই সমস্ত কিছুর উৎপত্তি। ব্রহ্ম নিজের আত্মসঙ্কোচনে জড় হয়েছেন, কিন্তু সেখানে তিনি থেমে নেই, স্বরূপে ফেরার জন্য ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পরম চৈতন্য হচ্ছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্বও শুধু জড় নয়, একইসঙ্গে চৈতন্যময়ও। যেহেতু আমরা জড়ত্বের দিকটি প্রথমে উপলব্ধি করি তাই আমরা তাঁর এই জগতকে যান্ত্রিক মনে করি। এবং নিজেদের অধ্যাত্মসাধনার অন্তরায় বলে কল্পনা করি। কিন্তু তা ঠিক নয় কারণ এই বিশ্বের অন্তরালে যে চিৎশক্তি রয়েছে তারই প্রকাশ ঘটে এই জীবের মধ্য দিয়ে। জীব চিৎশক্তির এই প্রকাশকে যথার্থভাবে সার্থক করে তোলে এই বিশ্বকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ জীবের সাধনার ক্ষেত্র হল এই জগৎ। শ্রীঅরবিন্দের মতে, জীব ও জগৎ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, কেননা ব্রহ্ম নিজেকে বহু রূপে দেখার জন্য যে চিৎশক্তির সঙ্কোচন করেছেন এই জগতের সমস্তকিছুর মধ্যে , আবার আত্মোন্মীলনের জন্য সেই চিৎশক্তির উত্তরণ ঘটিয়েছেন এই জীবের মধ্যে। ব্রহ্ম যেমন সত্য, জীব ও জগৎ তেমন সত্য। জীব ও জগৎ পরস্পর নির্ভরশীল এবং এই দুয়ের আশ্রয় হল ব্রহ্ম।[10] জীব হল ব্রহ্মের স্বরূপে ফেরার প্রধান মাধ্যম, জীবকে মাধ্যম করে জগত তার লক্ষ পূরণের পথে এগিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে শ্রীঅরবিন্দ বিবর্তন(Evolution) বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জীবের মধ্যে চেতনার গতিশীলতার প্রকাশ ঘটে খুবই ধীর গতিতে ও ধাপে ধাপে। যার প্রথম বা একদম নিচের স্তর হল জড়জগৎ। এই জড়জগৎ (Physical level) হতে প্রাণিক স্তর (Vital level) এসেছে যার প্রথম ভাগে আছে উদ্ভিদ (Plant), উদ্ভিদে চেতনা থাকে অস্ফুট। দ্বিতীয় ভাগে আছে পশু (animal), চেতনার প্রকাশ সেখানে অর্ধস্ফুট। এরপর প্রাণিক স্তরে মনের প্রবেশ ঘটল তখন এই স্তরের নাম হল মানসিক স্তর (Mental level)। অর্থাৎ মনের আগমনে তখন প্রকৃতিতে মানুষের আবির্ভাব হয়। এই মনের স্তরেই মানুষ যুক্তি-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হয়ে ক্রমে আত্মসচেতনতার সাথে বর্তমানে এক আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে থাকে। যেহেতু এই মনের স্তরের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল যথা- **প্রথমত,** এই স্তর সর্বদা কোনো বিষয়কে প্রথমে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে

[১০] অনির্বাণ, দিব্য-জীবন প্রসঙ্গ, কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০০, পৃষ্ঠা: ২১

তারপর নিজের যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত অংশ গুলোকে একত্রে জোড়া লাগায়। এই বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, আমাদের এই মনের দ্বারা পরমসত্তাকে জানা সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়ত,** এই স্তরে মানুষ তার চিন্তাভাবনাকে পুনরায় বারংবার ফিরে দেখতে পারে বা যুক্তি দ্বারা যাচাই করতে পারে। ফলে নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে, নিজের সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন তার মনে জাগ্রত হয়। তখনই মানুষ জীবন ও জগতের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য মনের এই চিন্তন স্তরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, চেতনার গতিশীলতা জীবের মনের স্তরে এসে থেমে যায় না। মনকে অতিক্রম করার এই প্রয়াসে পূর্ণযোগের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে পূর্ণযোগের দ্বারাই মনের স্তর অতিক্রম করে আসে অধিমানস স্তর, যখন মনের বিশ্লেষণধর্মী বৈশিষ্ট্য দূর হয়ে যায়। মানুষ এক অহং শূন্য অবস্থায় উপনিত হয় তখন সে জড়জগতকেও চেতনাময় রূপে উপলব্ধি করতে পারবে। এবং সবকিছুর সাথে আপন চেতনার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। সবই তার প্রকাশ তা উপলব্ধি করতে পারবে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, অধিমানস স্তরে পূর্ণযোগের কতগুলি ধাপ পরিলক্ষিত হয়।[11]

১) Higher Mind - সাধক যখন মনের স্তর অতিক্রম করে এই স্তরে পৌঁছোয় তখন জগতের প্রত্যেকটা বস্তুকে সে পরস্পর সম্পর্কিত বলে ভাবতে পারে। বা তার চিন্তায় সমস্ত বস্তু এক অখণ্ড রূপে ধরা দেয়। তার মনে তখন সামগ্রিকতার ধারণা তৈরি হয়।

২) Illumined Mind - এই স্তরে এসে মানুষ আগের স্তরের ভাবনার বা চিন্তার বিষয়বস্তুকে বাস্তবে দেখতে পায় বা উপলব্ধি করতে পারে। সে বাস্তবে দেখে সমস্ত বস্তু একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সমস্ত বস্তুগুলির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আছে তা সে বুঝতে পারে।

৩) Intuitive Mind - এই স্তরে যখন পৌঁছাবে তখন সাধক জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে যে চেতনা বিরাজমান সেই চেতনার সঙ্গে তার মধ্যে থাকা চেতনার সম্পর্ক স্থাপন করে। তখন এই বোধ জাগ্রত হয় যে আমার মধ্যে যেমন চেতনা আছে, তেমন জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যেও, জড়ের মধ্যেও চেতনা আছে। কিন্তু তা সুপ্ত অবস্থায় আছে। অর্থাৎ আমি সবকিছুর মধ্যে আছি এমন বোধ জাগ্রত হল এই স্তরে

৪) Over Mind - এই স্তরে এসে ব্যক্তিপুরুষ তার সকল ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে দূর করে বিশ্বপুরুষে পরিণত হবে। যার ফলে তখন মানুষের এই বোধ হবে যে, আমিই সবকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছি এবং আমার থেকেই সবকিছুর প্রকাশ ঘটছে; আমিই সব, আমার বাইরে আর অন্যকিছু নেই।

শ্রীঅরবিন্দের মতে অধিমানস স্তর অতিক্রম করলেই পাবো অতিমানস (Super Mind) স্তর। এই স্তরে এসে বিশ্বপুরুষের এমন বোধ হয় যে 'সবই ব্রহ্ম' এবং 'আমিই ব্রহ্ম'। ব্রহ্মের স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা, আনন্দধর্মী সত্তাকে সম্ভব করে এই অতিমানস স্তর। আর এই অতিমানস স্তরের পরেই আছে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। এই সমগ্রটাই সম্ভব হয় শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের দ্বারা, আর এই হল বিবর্তন (Evolution) প্রক্রিয়া অর্থাৎ এ হল ব্রহ্মের স্বরূপে ফেরার অভিযান, পরমচৈতন্যের চরম অবস্থার সন্ধান বা ব্যক্তিপুরুষের দিব্যজীবন লাভ। যে দিব্যজীবনে ব্যক্তির সবটাই পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণ বিশুদ্ধ, পূর্ণ মুক্ত, পূর্ণ স্বাধীন ও পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ হওয়া, ও পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করা। এই দিব্যজীবন হল ব্যক্তির এক অখণ্ড পূর্ণতা প্রাপ্তি হওয়া। যা শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগেই সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের মতে, এই সবটাই সম্ভব হবে আমাদের সমগ্র জীবন জুড়ে। কেননা পরমপুরুষ তাঁর লক্ষ্য লাভের জন্য আমাদের সমগ্র জীবনকে উপায় বা মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছেন। যদিও এখানে শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, যেকোনও পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র এই কতকগুলি পর্যায় অতিক্রম করলেই যে দিব্যজীবন প্রাপ্ত সম্ভব হবে তেমন নয়। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, যোগের পূর্ণতার জন্য বা যোগে সিদ্ধি লাভের জন্য মূলত চারটি বিষয় অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ- শাস্ত্র, উৎসাহ, গুরু ও কাল। সাধনার শুরুতে এই চার বিষয় মনে রেখেই অগ্রসর হতে হয় তবেই পূর্ণযোগ সম্ভব হয়।[12]

শাস্ত্র- শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন কোনও ব্যক্তির হৃদয় যদি একবার যুক্তি বুদ্ধির গণ্ডি ছাড়িয়ে অধ্যাত্মিকতার দিকে আগ্রহী হয় তবে তাঁর সম্মুখে যত বাধাই আসুক না কেন সব অতিক্রম করার শক্তি সে অর্জন করে সেই পরমসত্তার

[১১] অনির্বাণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯-৩৩

[১২] চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ, (অনুবাদক),প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-41-43

স্পর্শে। ব্যক্তি যদি এই পরমসত্তার স্পর্শ পায় সে ধীর গতি বা দ্রুত যে কোনও ভাবে সিদ্ধিলাভ করে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হতে গেলে শাস্ত্রীয় জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান বলতে শ্রীঅরবিন্দ দুই ধরণের শাস্ত্রের কথা বলেছেন। প্রথম প্রকার শাস্ত্র হল কোনও ধর্মগ্রন্থ। তা যতই প্রমাণ সাপেক্ষ বা যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন পরমসত্তার সম্পূর্ণ জ্ঞান তা থেকে লাভ করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে আমরা যে কোনও বিষয়ে আংশিক জ্ঞান লাভ করতে পারি। যেমন ভাগবতগীতা, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি এই ধরণের কিছু আধ্যাত্মিক স্তরের গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থগুলি থেকে যোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ পথের সন্ধান পেতে পারে কিন্তু চরম পথের সন্ধানে যোগীকে অন্তরাত্মার নির্দেশ মেনেই চলতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, প্রথম থেকেই যোগী অন্তরাত্মার নির্দেশ মেনে সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারলে তা শ্রেষ্ঠ হবে। দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র হল কোনও যোগপন্থার নিজস্ব কিছু তত্ত্ব, বিধি নিষেধ, আচার বিচার, ও পদ্ধতি থাকে। এই বিষয়গুলিকে একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে তাঁরা শাস্ত্র গঠন করে বা গুরু শিস্য পরম্পরায় শুনে শুনে সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রুতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আস্থা থাকলেও শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, তাঁর পূর্ণযোগের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রাচীন পরম্পরাগত শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে দিব্যজীবন লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হল পুরাতনকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নতুন ভাবে পথ চলতে। শ্রীঅরবিন্দ যেমন সমগ্র যোগের সমন্বয় করে পূর্ণযোগের প্রবর্তন করেন তেমন তিনি এই পূর্ণযোগের ক্ষেত্রে সাধকের পূর্ণ স্বাধীনতার ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে নিজের মত করে, নিজস্ব পথ ধরে নিজের মধ্যে পরম ব্রহ্মের উপলব্ধি করা ও জগতের সমস্ত কিছুতে তাঁর প্রকাশ ঘটানো। তাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগে যোগীর উদ্দেশ্যে কোনও বাঁধাধরা পথ রচনা করেননি। কিন্তু শুধুমাত্র সাধকের উত্তরণের প্রথম স্তরে পথ ভ্রষ্টের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য শ্রীঅরবিন্দ বাহ্যিক ভাবে সর্বজন স্বীকৃত সত্যের উপর ভিত্তি করে কতকগুলি নির্দেশাবলীর কথা স্বীকার করেন। যদিও তা কোনও চিরস্থায়ি কোনও নিয়ম নয়। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, বাহ্যিক জগত থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি না কেন যে শিক্ষা পূর্ব থেকে আমার অন্তরে অবস্থান করে তার অতিরিক্ত কিছুই জানার ক্ষমতা আমার নেই। সমস্ত কিছু নির্ভর করে আমাদের অন্তরাত্মার উপলব্ধির উপর।[13]

উৎসাহ - পূর্ণযোগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সহায় হল উৎসাহ বা আস্পৃহা। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের প্রধান লক্ষ্য হল বহুর মধ্যে একের অনুভুতি আবার বহুকে ছাড়াই একের অনুভুতি। এই বহুর মধ্যে থেকে একের দিকের যে যাত্রা সেখানে আমাদের সবার যাত্রা একই সময় হয় না, প্রত্যেকের জীবনে একই সঙ্গে উত্তরণের ডাক আসে না। কিন্তু যখন যে পরিস্থিতিতে তা আসুক না কেন আমাদের প্রত্যেকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় অদম্য ইচ্ছা শক্তি বা উৎসাহ বা আস্পৃহা নিয়ে। মনকে স্থির করে কোনও রকম স্ব-বিরোধীতা এবং কোনও অহংকেন্দ্রিক মানসিকতা ছাড়াই ব্যক্তিপুরুষকে নিজেকে আত্ম নিবেদন করতে হবে পরমসত্তার স্বরূপে ফেরার মহান কর্মে। প্রতি মুহূর্ত এখানে পরমসত্তার এই কর্মে মনকে নিয়োগ করতে হবে, সকল কর্ম যেন এই ভাবনা নিয়েই হয় যে সবটাই সেই চরম লক্ষ্য লাভের উপায় বা মাধ্যম। শুধু মন নয় দৈহিক ও প্রাণিক স্তরেও সকল প্রকার অনভিপ্রেত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে একই প্রকার অনুভুতি নিয়ে নিজেকে পরমসত্তার নিকট সমর্পণ করতে পারলে তবেই পূর্ণযোগ সম্ভব হবে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, সম্পূর্ণ ভাবে পরমব্রহ্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করলে তবেই লক্ষ্য লাভ সম্ভব হবে।[14]

গুরু- গুরু ব্যাতীত সাধনায় সাফল্যলাভ কোনও ভাবেই সম্ভব নয় তা সর্বজন স্বীকৃত। শ্রীঅরবিন্দও তা স্বীকার করেন, যদিও তাঁর কাছে বাহ্য গুরুর থেকে অন্তর্যামী গুরুর গুরুত্ব অধিক। শ্রীঅরবিন্দ যাকে তাকে গুরুর মর্যাদা দিতে চাননি, গুরুর কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন যেগুলির একটিও অনুপস্থিত থাকলে তাকে আর গুরু বলা যাবে না।

১) গুরুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শিষ্যকে সাধন পথে সঠিক মার্গ নির্দেশ করতে পারবেন।

---

[১৩] চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ (অনুবাদক), প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-42-45

[১৪] ঐ, পৃষ্ঠা-45-47

২) শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুর তিনটি অঙ্গ থাকবে-

অনুশাসন- গুরুর অনুশাসনের অর্থ হল শিষ্যের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো। কিন্তু গুরুর মতামত জোড় পূর্বক শিষ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। বা গুরুর মতামত এখন সঠিক মনে হলে যে সর্বদা সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকা নয় পরিস্থিতি এবং সময় অনুসারে যখন যে উপলব্ধি সত্য বলে গুরু নির্দেশ দেবেন সেটাই শিষ্যের জন্য অপরিহার্য এখানে গুরু বলতে তিনি অন্তর্যামী পরমসত্তার কথাই বলেছেন। কেননা তিনি গতানুগতিক গুরুর ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

আচরণ- শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, গুরুর আচরণ যথাযথ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গুরুর আচরণ সঠিক না হলে শিষ্যের স্বভাব-চরিত্রের উত্তরণে বাধা সৃষ্টি হবে। তাই গুরুর আচরণে যেন সর্বদা প্রশান্তি, শুদ্ধতা ও সহজ সরল মনোভাব বিরাজ করে।

অনুভব- অনুশাসন ও আচরণের সঙ্গে অনুভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শুধুমাত্র গুরুর কথিত বাণী শিষ্যের জন্য যথাযথ নয়। গুরুর এমন ক্ষমতা থাকতে হবে যে গুরুর মৌন্যতায়ও শিষ্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। অর্থাৎ গুরুর সর্বাংশ থেকে জ্ঞানের বিচ্ছুরণ ঘটবে আপনা থেকেই তবেই তিনি গুরু।

৩) গুরুর কোনও প্রকান অহং অভিমান যেন না থাকে। অর্থাৎ আমিই গুরু, আমার জ্ঞান আছে, আমি সব করছি এই অহঙ্কার যেন না থাকে। গুরু সর্বদা এই বোধ নিয়ে কর্ম করবে যে তিনি যা করছেন সবই সেই পরমসত্তার ইচ্ছা অনুস্বারে, পরমসত্তার লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে।[15]

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শন পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি শ্রীঅরবিন্দ নিজে একজন দক্ষ গুরু ছিলেন। দিব্য জীবন লাভের যথার্থ অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন। প্রথম জীবনে লেলে মহারাজের কাছে শ্রীঅরবিন্দ যোগ অভ্যাস করলেও পরবর্তী সময়ে লেলে মহারাজের সঙ্গ ছেড়ে একাই অন্তর্যামী গুরুর নির্দেশ অনুস্বারে সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে দিব্যজীবন লাভ করেছেন। যার ফলে তাঁর মধ্যে সর্বদা যথার্থ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে।

কাল- শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, কোনও সাফল্যের পশ্চাতে যথাযথ সময় বা কাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই যোগে সিদ্ধির জন্য অযথা তড়িঘড়ি করার কোনও ব্যাপার নেই। ধিরস্থির ভাবে বা ধৈর্য সহকারে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হলে যথা সময়ে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হবে। সবটাই হবে পরমসত্তার ইচ্ছা অনুস্বারে এবং তারই সময় অনুস্বারে।[16]

সমাজ বিবর্তনে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের গুরুত্ব বিচার করলে আমরা দেখব মানব সমাজের ক্রমপ্রসারিত বিবর্তন ধারা সম্পর্কে যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন সেটিই আবার যোগের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সমাজের বিবর্তন ধারা কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বহু প্রাচীন কাল থেকে অবিরাম গতিতে প্রসারিত হয়ে চলেছে।- প্রতীকমূলক পর্যায়, আদর্শমূলক পর্যায়, প্রথামূলক পর্যায়, ব্যষ্টিতান্ত্রিক পর্যায়, এবং বিষয়ীগত পর্যায়ে এসে বর্তমানে মানুষের গোষ্ঠীগত জীবনের পরিচয় হল জাতিরাষ্ট্র। এখন মানব সমাজের মূলচালিকা শক্তি হল যুক্তি-বুদ্ধি। যার অধীনে দীর্ঘসময় থেকে মানবসমাজ একটি বিষয় অনুধাবন করে যে মানুষের শুধুমাত্র দেহ, প্রাণ ও মন আছে তা নয় আছে আত্মা। আত্মা বলতে শ্রীঅরবিন্দ এখানে ব্যাপক অর্থে পরমাত্মাকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে পরমাত্মার স্বরূপ জানার জন্য যুক্তি-বুদ্ধি পর্যাপ্ত নয়, জড়জগতের জ্ঞান দিয়ে আত্মাকে জানা সম্ভব নয় আরও গভীরতর জ্ঞান লাভ করার পথে অগ্রসর হতে হবে, বোধির প্রয়োজন। তাঁর মতে, এখানে রাষ্ট্রকে সর্বেসর্বা রূপে গ্রহণ না করে বরং রাষ্ট্রের কাজ হবে সমস্ত মানুষের বিকাশের পথের সমস্ত অন্তরায় দূর করে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা লাভে সাহায্য করা। এবং ব্যক্তির কাজ হল জাতিরাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা। যাতে পরবর্তী কালে বিশ্বজনীন মানব সমাজ গঠন করা সহজ হয়ে ওঠে , কেননা বিশ্বরাষ্ট্রেও জাতি রাষ্ট্রের মত ব্যক্তির স্বাধীনতা খুন্ন হলেও মানসিক ভাবে মানবতার ধর্মের ধারণায় ব্যক্তি কিছুটা অভ্যস্ত হতে পারবে, যার দ্বারা রাষ্ট্রগুলি তাদের বৈচিত্র্য নিয়েই স্বাধীনভাবে গড়ে তুলবে স্বাধীন বিশ্বসংঘ। শ্রীঅরবিন্দের মতে, মানবতার ধর্ম

---

[১৫] চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ, (অনুবাদক), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-47-53

[১৬] ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৩-৫৪।

বলতে কোনও ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, মানবতার ধর্ম হল এক গভীর বিশ্বাস যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে দিব্যসত্তার বাস তাই আমরা সবাই এক। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, পরমাত্মা বা দিব্যসত্তার স্বরূপ প্রকাশের জন্য স্বাধীন বিশ্বসংঘ গঠনের মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এই আধ্যাত্মিক সমাজের কতকগুলি শর্ত বা গুন বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেগুলির একটিও অনুপস্থিতি থাকলে তাহলে আর আধ্যাত্মিক সমাজ বলা যাবে না।-১) ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর অহং দূর করে পরম সত্তার লক্ষ্য লাভে নিজেকে সমর্পণ করা, ২) সমগ্র মানব সমাজকেই পরমব্রহ্মের প্রকাশ রূপে, এবং লক্ষ্য লাভের উপায় রূপে গণ্য করতে হবে, কাউকেই সমাজের জন্য সমস্যা বা অপরাধী বলা যাবে না। ৩) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে বিকশিত করার জন্য সবাই সমান সুযোগ পাবে। ৪) রাষ্ট্র নিজেকে সর্বেসর্বা ভাববে না, ব্যক্তির বিকাশের পথের সমস্ত অন্তরায় দূর করবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে। ৫) শ্রীঅরবিন্দের মতে, আধ্যাত্মিক মানবসমাজ গড়ে তুলতে হলে ব্যষ্টিকে তার নিজের ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশকে সুসম্পন্ন করতে হবে; কিন্তু একই সঙ্গে অন্যের মধ্যেও এইরূপ স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, অপরের সম্ভাবনা বিকাশে সাহায্য করতে হবে। সমাজবদ্ধ সমষ্টি জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের একটা সামঞ্জস্য বিধান করে অগ্রগতি ও পূর্ণতার শক্তিরূপে নিজেকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে সমর্পিত করে দিতে হবে। আবার একই ভাবে গোষ্ঠী ও জাতির নীতি হল নিজের সমষ্টিগত অস্তিত্বকে রক্ষা করার সঙ্গেই ব্যষ্টিকে স্বাধীন বিকাশে সাহায্য করতে হবে একই সঙ্গে অন্য গোষ্ঠী বা জাতির বিকাশকেও মর্যাদা দিতে হবে, সাহায্য করতে হবে, এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশের অগ্রগতি ও পূর্ণতার শক্তিরূপে নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে। একই ভাবে সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের নীতি হল প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও বিবিধ মানব জোটের স্বাধীন বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজকে একটা দিব্য পরিবারে পরিণত করা।[17] ৬) সমাজে এমন একাধিক ব্যক্তি থাকতে হবে, যাঁরা আত্মার স্বরূপে নিজেদের দেখতে, বিকশিত করতে ও পুনর্গঠিত করতে সমর্থ এবং তাঁরা তাঁদের ধারণাগুলিকে জনসমষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন। সেই সঙ্গে এমন একটি জনসমষ্টি, একটি সমাজ থাকতে হবে, যে সমাজ চূড়ান্ত পরিবর্তন হওয়ার পূর্বেই পিছু হটে যাবে না।[18]

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, এই শর্তগুলি পূরণের মধ্য দিয়ে একদিন অবশ্যই আধ্যাত্মিক মানবসমাজ গঠিত হবে। আধ্যাত্মিক মানব সমাজের প্রত্যেক সদস্য হবেন দিব্যজীবন প্রাপ্ত। অর্থাৎ সমগ্র মানবসমাজ দিব্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁর মতে, সবটাই তরান্বিত হবে পূর্ণযোগ সাধনার দ্বারা। শ্রীঅরবিন্দ সমাজ ও রাষ্ট্র বিবর্তনের যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ স্বীকার করেছেন, তা হল পরমব্রহ্মের ফেরার অভিযান যা সম্ভব একমাত্র ব্যক্তি ও সমগ্র মানব সমাজের চেতনার উত্তণের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যক তত্ত্বে যা পেলাম- জীবাত্মা বা জীবের চৈতন্যকে পরমাত্মায় বা পরম চৈতন্যে উত্তরণ, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়া। এখানেই শ্রীঅরবিন্দ সমাজ জীবনের সঙ্গে অধিবিদ্যকতত্ত্ব ও পূর্ণযোগের মেলবন্ধন করেন। ব্যক্তি তথা সমগ্র মানব সমাজের এই উত্তরণ পূর্ণযোগ ব্যতীত সুদূর প্রসারিত। পূর্ণযোগের দ্বারা সমগ্র আধ্যাত্মিক সমাজে মানুষ নিজেকে পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করবে। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যকতত্ত্ব, পূর্ণযোগ এবং সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন এই সবটাই একটি মূল লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহল জগতের মধ্যে সর্বভূতে এবং জগতকে অতিক্রম করে সমস্ত কিছুতে এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন ও তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এটাই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের সার্থকতা।

---

[১৭] ভট্টাচার্য, মনোজ, (অনুবাদক), *মানব যুগচক্র (Sri Aurobindo: The Human Cycle)*, পন্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, প্রথম সংস্করণঃ ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৬৬-৭৬

[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা-২৭৬

গ্রন্থপঞ্জী

১. অনির্বাণ, দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০০
২. অনির্বাণ, যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৫ই এপ্রিল ১৯৬৭, তৃতীয় প্রকাশ- ১৫ই আগস্ট ২০১৩
৩. কবিরাজ শ্রীগোপীনাথ, তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্ দর্শন (প্রথম খণ্ড) সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৬৩
৪. কবিরাজ শ্রীগোপীনাথ, তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮৩
৫. ঘোষ, প্রমদারঞ্জন (অনুলেখক ও সম্পাদক), শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন, কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ- জুন, শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ- এপ্রিল, ২০০১
৬. চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ (অনুবাদক), শ্রীঅরবিন্দ যোগসমন্বয়, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, প্রথম সন্সকরন-১৯৭২, তৃতীয় মুদ্রণ- ২০১৬
৭. দত্ত, মোহিনীমোহন ও গুপ্ত শ্রীনলিনীকান্ত (অনুবাদক), শ্রীঅরবিন্দ যোগের পথে আলো, পন্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, প্রথম সংস্করণ- ১৯৪১, ষষ্ঠ সংস্করণ- ২০২০
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোককুমার (সম্পাদক), সায়ন মাধবীয়ঃ সর্বদর্শন সংগ্রহ, কলকাতা, সদেশ, প্রথম সংস্করণ- ২০০৫
৯. ভট্টাচার্য, মনোজ (অনুবাদক), মানব যুগচক্র শ্রীঅরবিন্দ, পন্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩
১০. ভট্টাচার্য, সুখময়, অভিনবগুপ্ত প্রণীত তন্ত্রালোক, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯২
১১. মজুমদার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা, কলকাতা- শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, প্রথম প্রকাশ শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-শতবার্ষ - ১লা জুলাই, ১৯৭২, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ- ২৪শে নভেম্বর, ২০০০
১২. মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ (অনুবাদক) , সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ (নীরদবরণ), কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭
১৩. রায়, শ্রীদিলীপকুমার, যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ
১৪. সৎপ্রেম, শ্রীঅরবিন্দ অথবা চেতনার অভিযান, ভারতবর্ষ, মহীশূর, মীরা অদিতি সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯
১৫. সেন, প্রমোদকুমার, শ্রীঅরবিন্দ জীবন ও যোগ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ- ১৫ই আগস্ট, ২০০৪
১৬. স্বামী, অভেদানন্দ, যোগদর্শন ও যোগসাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ় ১৩৯১, পুনর্মুদ্রণ- ভাদ্র ১৪২৬
১৭. স্বামী অভেদানন্দ, যোগশিক্ষা, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ১৯৪৭, পুনর্মুদ্রণ- ডিসেম্বর ২০১৮
১৮. স্বামী, নিত্যমুক্তানন্দ, কর্মযোগ স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ, কলকাতা, বাগবাজার, ৮০তম পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী, ২০২৪
১৯. স্বামী, সুন্দরানন্দ, যোগচতুষ্টয়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নবম মুদ্রণ- ডিসেম্বর ২০১৯